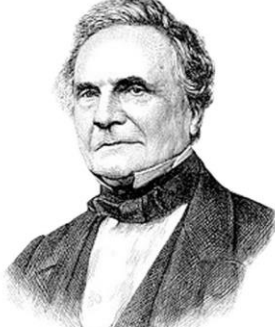


চার্লস ব্যাবেজ:



চার্লস ব্যাবেজ কে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। তিনি ১৭৯১ সালের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। চার্লস ব্যাবেজের সবচেয়ে আলোচিত দুটি আবিষ্কার হল ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন ও অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন নামের দুটি কম্পিউটার। তিনি ১৮৩৩ ও ১৮৪২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করার চিন্তা করেন যা সকল ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা যায়। আর সেই যন্ত্রটিই হল অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের অনেক ডিজাইন আধুনিক কম্পিউটারের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক ও বলা হয়। তিনি ১৮৭১ সালে মারা যান।

[<https://hello.bdnews24.com/onyachokhe/article7136.bdnews>]

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল:



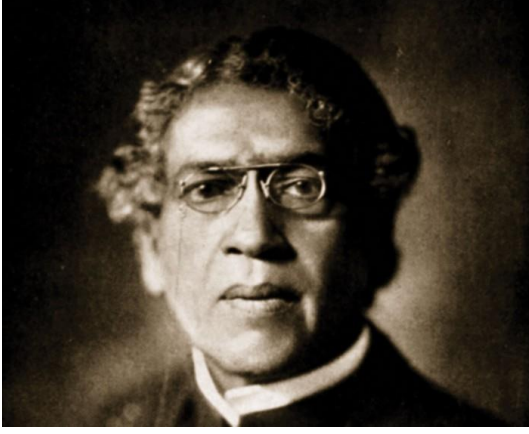
ম্যাক্সওয়েলের জন্ম ১৮৩১ সালে, স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে, ধনবান এক স্কটিশ পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তার বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি ছিল প্রডিজিস্বরূপ। আট বছর বয়সেই কবি জন মিল্টনের বড় বড় কবিতা, কিংবা বাইবেলের সবচেয়ে লম্বা স্তব তিনি মুখস্ত আবৃত্তি করতেন। তাঁর প্রথম অ্যাকাডেমিক পেপার বের হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে, সেখানে তিনি গাণিতিক গ্রাফ প্লট করার নতুন কিছু উপায়

দেখিয়েছিলেন। সেই পেপার আবার রয়েল সোসাইটি অফ এডিনবার্গে পড়াও হয়েছিল, তিনি বয়সে বেশিই ছোট ছিলেন বলে তাকে নিজের পেপার নিজেকে পড়তে দেয়া হয়নি। জেমস ম্যাক্সওয়েল উচ্চতর শিক্ষার জন্য পড়েছিলেন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানেও তিনি গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানে সেরা পারফরমেন্সের জন্য পেয়েছিলেন স্মিথস প্রাইজ। ২৫ বছর বয়সে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ এবারডিনের 'চেয়ার অফ ন্যাচারাল ফিলোসফি' হিসেবে নিযুক্ত হন। তখন পদার্থবিজ্ঞানের নাম ছিল 'ন্যাচারাল ফিলোসফি'। অর্থাৎ ২৫ বছর বয়সেই তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান অনুষদের প্রধান হয়ে গিয়েছিলেন!

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলোর প্রকাশ হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি। সমীকরণগুলো প্রথম গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে আলো, তড়িৎ, আর চৌম্বকত্ব আসলে একই বল থেকে আসে- তড়িৎচৌম্বক বল। বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে মৌলিক বলগুলোকে একীভূত করা, এবং এই কাজটি ম্যাক্সওয়েল সেই ১৮৬১ সালে যতটা এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, এরপর কেউই আর আর অতটা এগোতে পারেননি। এখন আমরা জানি, ইলেকট্রন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে যা হয় তা তড়িৎ, ইলেকট্রনেরা একই দিকে ঘুরলে আমরা পাই চৌম্বকত্ব আর ইলেকট্রনকে উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে নিয়ে আসলে আমরা পাই আলো বা ফোটন। সবকিছুই আসলে একই বলের বিভিন্ন রূপ- তড়িৎচৌম্বক বল। ইলেকট্রনের মাধ্যমেই তার প্রকাশ। এখন পাঠক ভেবে দেখুন, এ সবকিছুই তিনি কিছু গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, অথচ ইলেকট্রন তখনও আবিষ্কারই হয়নি। এর আবিষ্কার হতে তখনো বাকি ৩০ বছর! তিনি বিদ্যুতের উপর চুম্বকের প্রভাব আর চুম্বকের উপর বিদ্যুতের প্রভাবকে পর্যবেক্ষণ করে এসব বুঝে ফেলেছিলেন। এই প্রভাবকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তড়িতচুম্বক তরঙ্গ দিয়ে। তিনি সেই তরঙ্গের গতিও মেপে ফেলেছিলেন, দেখা গেল সেই গতি আলোর গতিরই সমান, আর যেহেতু আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি, তাই বলা গেল যে তড়িতচুম্বক তরঙ্গ আর আলো আসলে একই জিনিস। আইনস্টাইন নিজেই বলেছিলেন, “আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি উদ্ভবের জন্য আসলে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলোর কাছে ঋণী।”

[<https://roar.media/bangla/main/biography/james-clerk-maxwell-best-physicist>]

জগদীশচন্দ্র বসু:



বিজ্ঞানের নানা শাখায় কাজ করেছিলেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা। তার গবেষণার ফলে উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা হয় তার হাত ধরে। ময়মনসিংহে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর জন্ম এই বিজ্ঞানীর। ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করে। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চা (এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স) শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখেছেন। তার গবেষণা উদ্ভিদবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা করেন। বিজ্ঞানী মার্কনি রেডিও আবিষ্কারের আগেই বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বিনা তারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তথ্য-সংকেত বিনিময়ে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রদর্শনও করেছিলেন। নিরহংকারী এই মহাত্মা গোটাকয়েক যন্ত্রের আবিষ্কার করলেও পেটেন্টের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। এমনকি রেডিও সিগনাল শনাক্তকরণে সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবহার বিষয়ে তার করা গবেষণাপত্র তিনি উন্মুক্ত করে দেন যেন অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ এটি নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। ১৯০৯ সালে মার্কনিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো। আর বাঙালি বিজ্ঞানী বেতার তরঙ্গের সৃষ্টির আবিষ্কারক হিসেবে অজ্ঞাত থেকে গেলেন। পদার্থবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি বিভিন্ন সমস্যা সামধানের চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তার বিচরণ ছিল, বিশেষ করে জীব পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব-এগুলো নিয়েও তার কাজ আছে। তিনি সব সময় জীব ও জড়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান খুঁজতেন। বিজ্ঞানের ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখায় জগদীশ কাজ করেছিলেন শুধু সত্য জানার উদ্দেশ্যে। তিনি বিশ্বকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তা নিয়েও প্রথমে

কম কথা শুনতে হয়নি তাকে। তবে অনেক লড়াইয়ের পর এই আবিষ্কারটা তার থেকে আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

[<https://www.ekusheytv.com/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0/84966j>]

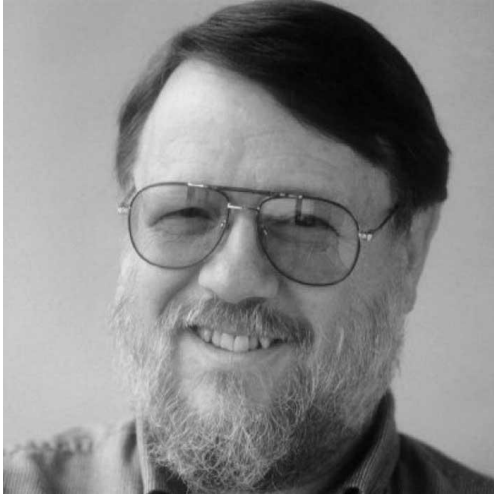
গুগলিয়েলমো মার্কনি:



১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল গুগলিয়েলমো মার্কনি ইতালির বোলোনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ছিলেন না। তার পিতা ছিলেন ইতালির একজন ধনী ব্যবসায়ী। সাত বছর বয়সে কিছু দিনের জন্য মার্কনি স্কুলে গিয়েছিলেন এবং তার পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ জন্মে। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, স্কুলিঙ্গ থেকে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা বিনা তারেই কিছু দূর যেতে পারে। শুরু হলো তার গবেষণার কাজ। তিনি চার তলায় একটি ঘরে বসে বোতাম টিপে নিচতলার একটি বেল বাজিয়ে ফেললেন যেখানে তারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ইতালি সরকার এ ক্ষুদ্রে বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের প্রতি তেমন আগ্রহ না দেখানোর ফলে মার্কনি পিতার উৎসাহে অনেকটা বাধ্য হয়েই ইংল্যান্ডে চলে যান। মার্কনির কাজ শুরু হলো লন্ডন জেনারেল পোস্ট অফিসের একটি কক্ষ থেকে পাশের বাড়ির কাছে বার্তা প্রেরণের মধ্য দিয়ে। অতঃপর ১৮৯৯ সালে ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ওপারে প্রেরিত হলো বার্তা। কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল আটলান্টিকের এপার থেকে ৩৩৭৮ কিলোমিটার দূরে ওপারে বার্তা প্রেরণ। সেকালের বিজ্ঞানীরা অনভিজ্ঞ মার্কনির এ স্বপ্নের সফলতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এই ভেবে যে, ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য বহু দূরবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের বার্তা পাঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এ অসম্ভবকে সম্ভব

করলেন ১৯০১ সালে এবং আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে বেতারসংকেত পাঠাতে সক্ষম হলেন। তার এ সাফল্য ছিল মানবজাতির জন্য যুগান্তকারী। ১৯০৯ সালে সরকার কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং ইতালি সরকার তাকে আজীবন সিনেট সদস্য নির্বাচিত করে। একই বছর পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অবশ্য মার্কনির আগেও ম্যাক্সওয়েল, হার্স কেলভিন, জগদীশচন্দ্র বসু, আলেক্সান্দর গম্বোল্ড প্রমুখ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন। তাদের সেই অসমাপ্ত কাজকে সাফল্যের দিকে ধাবিত করে বিজ্ঞানী মার্কনি অমর হয়ে আছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কনি ইতালীয় বেতার-সার্ভিসের কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মার্কনি ৬৩ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে পরলোকগমন করেন।

রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন:



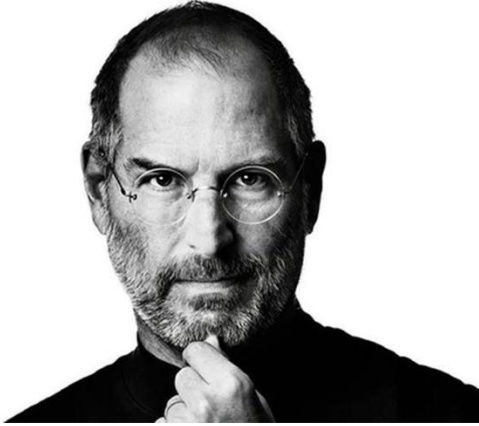
রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন বিখ্যাত মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও বিশ্বের প্রথম ই-মেইলপ্রবর্তনকারী। ১৯৭১ সালে ইন্টারনেটের সূচনাকারী আরপানেটে রে টমলিনসন প্রথম ই-মেইল পাঠান।

১৯৪১ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি নিউইয়র্ক এর অ্যামস্টারডামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর আগে একই কম্পিউটারের বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের মধ্যে মেইল আদান-প্রদান করা যেত। কিন্তু টমলিনসনের পদ্ধতিতে প্রথমবারের মতো আরপানেটে যুক্ত বিভিন্ন হোস্টের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব হয়। তিনিই প্রথম কম্পিউটার এবং এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য

ব্যবহারকারীর নামের সামনে ‘অ্যাট দ্য রেট অব (@)’ চিহ্নটি ব্যবহার শুরু করেন। তারপর থেকে ই-মেইলে এই চিহ্নটি ব্যবহার হয়ে আসছে। ইন্টারনেট হল অব ফেমে রে টমলিনসনের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "টমলিনসনের ই-মেইল প্রোগ্রাম মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে একটি নতুন বিপ্লবের সূচনা করে"। টমলিনসন প্রথম যে ইমেইলটি পাঠান সেটি ছিল পরীক্ষামূলক। টমলিনসন এটিকে গুরুত্বহীন বলেছেন এবং এটি সংরক্ষণও করা হয়নি, যেটি ছিল এমন অর্থহীন "QWERTYUIOP", প্রচলিত ইংরেজি কী-বোর্ডের উপরের সারির অক্ষরগুলো নিয়ে। মাঝে মাঝে ভুলভাবে বলা হয় "প্রথম ইমেইল ছিল QWERTYUIOP"। টমলিনসন পরে বলেছেন, "পরীক্ষামূলক বার্তাগুলো মনে রাখার মত কিছু ছিল না তাই আমি সেগুলো মনেও রাখিনি।" শুরুর দিকে তাঁর ই-মেইল সিস্টেমকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়নি। তাঁর এক সহকর্মী জেরি বার্চফিলকে তিনি বলেছিলেন, "কাউকে বলো না। এগুলো আমাদের করার কথা ছিল না।" ২০১৬ সালের ৫ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[<https://taiyabs.wordpress.com/2009/04/25/marconi/>]

স্টিভ জবস:



স্টিভ জবসের পুরো নাম স্টিভেন পল জবস। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান উদ্ভাবক, ডিজাইনার এবং অ্যাপল কম্পিউটারের সহ-উদ্যোক্তা, সিইও ও চেয়ারম্যান। অ্যাপলের বিশ্বখ্যাত পণ্য আইপড, আইপ্যাড, আইফোন, আইম্যাককে ধরা হয় বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির শুরুর ধাপ হিসেবে। এর

সবগুলোর পেছনেই ছিল তাঁর সরাসরি অবদান। তিনি জন্মেছিলেন ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রানসিস্কোতে। তাঁর বাবা ছিলেন আব্দুল্লাহ ফাতাহ জান্দালি এবং মা ছিলেন জোয়ান ক্যারোল। জবসের জন্মের সময় তাঁর মা-বাবা দুজনই স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। তাই তাঁদের সন্তানকে দত্তক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে পল ও ক্লারা জবস স্টিভ জবসকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং নতুন নাম দেন স্টিভেন পল জবস। ছোটবেলা থেকেই জবস ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান; কিন্তু লক্ষ্যহীন। কলেজ থেকে ড্রপ-আউট হয়ে ১৯৭৬ সালে স্টিভ ওজনিয়াকের সঙ্গে অ্যাপল শুরু করার আগ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ১৯৮৫ সালে অ্যাপল ইনকরপোরেশনের ‘বোর্ড অব ডিরেক্টরসের’ সদস্যদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে তিনি অ্যাপল ইনকরপোরেশন থেকে পদত্যাগ করেন এবং পিকচার এনিমেশন স্টুডিও ও নেক্সট কম্পিউটার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৬ সালে অ্যাপল কম্পিউটার নেক্সট কম্পিউটারকে কিনে নিলে তিনি ১১ বছর পর আবার সিইও হিসেবে অ্যাপলে ফিরে আসেন। তিনি ১৯৯৫ সালে টয় স্টোরি নামের এনিমেটেড চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন। তাঁর দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন লরেন পাওয়েল এবং তিনি ছিলেন চার সন্তানের জনক। স্টিভ জবস ১৯৮৫ সালে স্টিভ ওজনিয়াকের সঙ্গে প্রথম ন্যাশনাল মেডেল অব টেকনোলজি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ২০১১ সালে ৩২ জনের নাম ‘পার্সন অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে মনোনীত করে। এ তালিকায় অ্যাপ্লে মার্কেল, বারাক ওবামা, সিলভিও বারলুসকোনি, লিওনেল মেসি প্রমুখ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তিনিও স্থান পেয়েছেন। ২০১১ সালে অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে জবস মারা যান।

উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস:



মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের জীবন কেটেছে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ না করেই মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তির আসনে ওঠা এবং দানশীল হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছেন তিনি। কিন্তু একসময়ের কঠোর ব্যবস্থাপক, দুর্দান্ত চিন্তক বিল গেটস কিন্তু খাবার শেষে নিজের প্লেট নিজে ধোয়ার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর জীবনে এমন কিছু মজার ঘটনা আছে, যা আনন্দদায়ক।

দুট্টু বিল গেটস কিশোর বিল গেটস কিন্তু একেবারেই শান্তশিষ্ট ছিলেন না। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর পছন্দের সব মেয়েকে এক ক্লাসে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কিশোর বিল গেটসকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার ব্যবহার করে একটি ক্লাস শিডিউল তৈরি করে দিতে বলেছিল। এই সুযোগ কাজে লাগান তিনি। তাঁর পছন্দের সব মেয়েকে দিয়ে নিজের ক্লাস ভরান। হার্ভার্ডে পড়াশোনায় ফাঁকি হার্ভার্ডে পড়ার সময় যেসব কোর্সের জন্য নিবন্ধন করেছিলেন, তার একটিতেও হাজিরা দেননি। এর পরিবর্তে তাঁর ভালো লাগত যেসব ক্লাস, সেখানে বসে যেতেন। তবে তাঁর মুখস্থবিদ্যা ছিল দুর্দান্ত। ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাঁকে আটকায় কে? ফলে ক্লাস না করেও সব সময় এ গ্রেড পাওয়া ছাত্র ছিলেন বিল গেটস। পড়াশোনা খোড়াই কেয়ার হার্ভার্ডে পড়ার সময় ২০ বছর বয়সী বিল গেটস ‘প্যানকেক সার্টিং’ নামের দীর্ঘদিনের এক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। তাঁর অধ্যাপক যখন ওই সমাধানটি একাডেমিক পেপারে প্রকাশের কথা বলেন, তখন বিল গেটস মাইক্রোসফট নিয়ে ঝুঁকে পড়েন। হার্ভার্ডের সাবেক অধ্যাপক ক্রিস্টোস পাপাডিমিত্রি লিখেছেন, ‘দুই বছর পর যখন বিল গেটসকে ডেকে বলা হলো, তাঁর সমাধানটি গণিতের সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তখন তাঁর আগ্রহ দেখা যায়নি। সে নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কে

মাইক্রোপ্রসেসরের মতো যন্ত্রের জন্য কোড লিখতে ছোট একটি কোম্পানি চালাতে আগ্রহী।’
ক্রিস্টোফ লিখেছেন, এ রকম মেধাবী একজন ছেলে গোল্পায় যাচ্ছে বলে ভেবেছিলেন তিনি।

কারিগরিতে ওস্তাদ:

বিল গেটসকে কারিগরি দিক থেকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো সফটওয়্যার তৈরির মাঝপথে তিনি বাগড়া দেন না। কিন্তু এক মিনিটের জন্যও তাঁকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। কারণ, তিনি একজন সত্যিকারের প্রোগ্রামার।

স্পেচ্চাসেবী:

খাবারের পর, বিশেষ করে রাতের খাবারের পর নিজের গ্লোট নিজে ধুয়ে ফেলেন তিনি। তিনি বলেন, অন্যরা সাহায্য করতে চাইলেও নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করেন তিনি।

মজার মানুষ:

একবার এক সাক্ষাৎকারের সময় হলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসেন বিল গেটস। সাংবাদিককে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন তিনি। ওই সময় বাথরুমের গিয়ে নিজেকে আটকে রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সাংবাদিক ক্ষমা না চান, ততক্ষণ বাথরুমে বসে থাকার হুমকি দেন। তাতে কাজ হয়। মাইক্রোসফটের প্রতিবেদক ম্যারি জো ফলি এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান। ফলি বলেন, মজার একটি ঘটনা এটি। কমডেক্স নামের এক সম্মেলনের সময় কয়েকজন সাংবাদিক মিলে গেটসের সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ করেন। ওই সময়কার বিখ্যাত সাংবাদিক জন ডজ খেপিয়ে দেন বিল গেটসকে। অবশ্য তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার ধরন ছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি বিল গেটসকে ‘বাজারের সংজ্ঞা কী’ জাতীয় প্রশ্ন করেন। এতে বিল খেপে যান এবং উঠে গিয়ে বাথরুমে যান এবং নিজেকে আটকে রাখেন। বলেন, জন ক্ষমা না চাইলে আর বেরোবেন না। জন তখন বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে বলেন, ‘আই অ্যাম সরি।’

[<https://www.prothomalo.com/education/sciencetech/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF>]

টিমোথি জন বার্নার্স লি:



টিম বার্নার্স-লি বা স্যার টিমোথি জন ‘টিম’ জন বার্নার্স-লি (Tim Berners-খবব) জন্ম জুন ৮, ১৯৫৫), এবং TimBL নামেও যিনি পরিচিত, যিনি পেশায় একজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, MIT অধ্যাপক এবং (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জনক এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়ামের পরিচালক। তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। টিম বার্নার্স-লি শীন মাউন্ট প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের এমানুয়েল স্কুলে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন এবং তিনি সেখানে প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। টিম বার্নার্স-লি সার্ন এ ১৯৮০ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি পুনরায় সার্ন এ যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ওয়েবের ধারণা দেন। তখন তিনি CERN ল্যাবে সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। CERN ল্যাব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, যেখানে বৈজ্ঞানিক লব্ধ ফলাফলের জন্য যে ডেটাবেজ ব্যবহার করা হতো। তার লাখ ছিল কীভাবে একটি কম্পিউটারে তথ্য রেখে তা অন্য কম্পিউটার থেকে একসেস করা যায়। এই ধারণা থেকেই ওয়েবের উদ্ভব। তিনি তখন একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি world web consortium (W3C) ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত এবং পরবর্তী কালে world wide web foundation প্রতিষ্ঠা করেন। সম্মানসূচক ডক্টরেট অব সায়েন্স, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২০১১, সম্মানসূচক ডক্টরেট অব সায়েন্স, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, অর্ডার অব মেরিট, নাইট কমান্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, ফেলো অব দ্য রয়েল সোসাইটি, ফেলো অব দ্য রয়েল একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেলো অব দ্য রয়েল সোসাইটি অব আর্টস।

[<https://www.dailyjanakantha.com/details/article/383630/%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF/>]

মার্ক জুকাবেৰ্গ:



সারা দুনিয়াকে এক সুতোয় বেঁধেছে ফেসবুক। আজকাল ফেসবুকে নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই কঠিন। ভার্চুয়াল জগতে ফেসবুক এখন একক রাজত্ব। এই ফেসবুকের প্রতিষ্ঠা মার্ক জুকাবেৰ্গ। পুরো নাম মার্ক এলিয়ট জুকাবেৰ্গ, একজন আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও সফটওয়্যার ডেভেলপার। তিনি ১৯৮৪ সালের ১৪ই মে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বে বহুলভাবে পরিচিতদের মাঝে একটি অন্যতম নাম।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সাল থেকে মার্ক জুকাবেৰ্গ ফেসবুক নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই ফেসবুকের যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তখন শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিলো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রীক। তখন হার্ভার্ডের ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু এটির ব্যবহার করতেন। ২০০৫ সালের পর থেকে ফেসবুক সারা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রথমদিকে নাম ছিলো “দ্য ফটো এড্রেস বুক”। এটি ছিলো অনেকটা ‘স্টুডেন্টস ডাইরেক্টরি’র মতো। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নাম, ফোন নাম্বার, তাদের বন্ধুদের নাম, পাঠ্যরত বিভাগের নাম ইত্যাদি লিখে রাখতে পারতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এর নাম রেখেছিলো ‘দ্য ফেসবুক’। এবং পরে ‘দ্য’ বাদ দিয়ে এর নাম হয়ে যায় “ফেসবুক”। ২০১০ সালে টাইম ম্যাগাজিনের

দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বের প্রভাবশালী এবং অর্থবিত্তসম্পন্ন ১০০ জনের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন। তিনি ২০১৩ সালের এপ্রিলে ফেসবুক কোম্পানীর চেয়ারপারসন এবং প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সেপ্টেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাবমতে তার সম্পদের পরিমাণ এখন ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারী ১.৮৬ বিলিয়ন এর উপরে। ইন্টারনেটের আর কোনো সামাজিক মাধ্যম এত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। ইয়াহ ফেসবুক কিনতে চেয়েছিলো ১ বিলিয়ন ডলারে। মার্ক জুকারবার্গ সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। মার্ক জুকারবার্গ মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিলিয়নিয়ার হন। যা ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে বিলিয়নিয়ার হওয়ার একটি রেকর্ড। বর্তমানে মার্ক জুকারবার্গ এর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে ৬ নম্বরে রয়েছেন। মার্ক প্রতি বছর নতুন করে একটি বড় ‘চ্যালেঞ্জ’ নেন। এবং তা শেষ করেন। ২০১৬ সালের চ্যালেঞ্জটি হল তিনি মোট ৩৬৫ মাইল (৩৬৫ দিনে) দৌড়াবেন। তবে ইতিমধ্যেই তিনি সেই চ্যালেঞ্জ টি শেষ করে ফেলেছেন। মার্ক জুকারবার্গ ‘মান্দারিন’ ভাষা শিখেন ২০১০ সালে যাতে করে তিনি তার স্ত্রীর পরিবারের সাথে তাদের ভাষায় সাথে কথা বলতে পারেন। মার্ক ও প্রিসিলা তাদের ফেসবুক এর শেয়ার এর ৯৯% ই দান করে যাবেন। যার মূল্য বর্তমানে প্রায় ৪৮ বিলিয়ন ডলার।

আমরা ফেসবুকে অন্যান্য ওয়েবসাইট এর মত বিজ্ঞাপন দেখি না। কারণ, জাকারবার্গ মনে করেন বিজ্ঞাপন আসলে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই বিরক্তিকর। বিখ্যাত কোম্পানি ইয়াহ, MTV জুকারবার্গের কাছে বিজ্ঞাপন বিক্রি করতে আসেন, কিন্তু জুকারবার্গ তা গ্রহণ করেন নি। জুকারবার্গ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। তার এই সিদ্ধান্ত ছিল ফেসবুককে আরো সময় দেয়ার জন্য। মার্ক জুকারবার্গ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি তে পড়াকালীন তার হোস্টেল রুম থেকেই ফেসবুক লাঞ্চ করেন। যখন জুকারবার্গ হাই স্কুলে পড়তেন, তখন তিনি একটি মোবাইল অ্যাপ বানান যা কিনা বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফট, AOL এর চোখে পড়ে। তখন ওই কোম্পানি গুলো তার এপটি কিনে নিতে চায় এবং তাকে চাকুরির অফার ও দেয়। কিন্তু তিনি তার কোনটাই গ্রহণ করেন নি। এবং ওই এপটি তিনি ফ্রি তে ইন্টারনেট এ ছড়িয়ে দেন। মার্ক এর বাবা-মা, তিনি স্কুলে পড়ার সময় তার জন্য বাসায় একজন কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেন। কিন্তু কিছুদিন পর ঐ শিক্ষক জানিয়ে দেন যে, তার পক্ষে মার্ক কে পড়ানো খুবই বিরক্তিকর, কারণ মার্ক মাঝে মাঝেই তার শিক্ষক কে ছাড়িয়ে যান। মার্ক জুকারবার্গ খুবই ছোট বয়স থেকেই কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করা শুরু করেন। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সেই উনার বাবার ডেন্টাল অফিসের জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেন। যার নাম দেন ‘Zucknet’। মার্ক জুকারবার্গ সবসময় ছাই রঙের একটি টি-শার্ট পড়ে ফেসবুক কার্যালয়ে আসেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করলে তিনি বলেন, তিনি চান না অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে, যত সময় পান তার সবটাই তিনি ফেসবুক কমিউনিটি তথা পৃথিবীর সবার উন্নতির জন্য ব্যয় করতে চান। তাই তিনি সবসময় একই রঙের টি-শার্ট পরিধান করেন, যাতে কোনদিন কোন রঙের টি-শার্ট পরবেন তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না হয়। জুকারবার্গ তার বাড়িতে কোন TV রাখেন না, এবং ভবিষ্যতে রাখারও কোন ইচ্ছা নেই। কারণ, তিনি সাধারণত কম্পিউটার এ কাজ করেই সময় কাটান। মার্ক জুকারবার্গ লাল-সবুজ বর্ণাঙ্ক। যার ফলে ফেসবুকের থিম ও নীল-সাদা রঙের। কারণ তিনি নীল রঙটি ভাল দেখতে পান। তিনি বলেছেন, বিশ্বের প্রত্যেকজনকে যোগাযোগের মধ্যে বা পারস্পরিক কাছাকাছি নিয়ে আসার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রয়োজনও অপরিসীম। সমাজকে ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর করতে এবং প্রত্যেকের কষ্ট বা ভাব প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। অর্থবিত্ত বানাতে নয়, ভালো সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ আয়ই লক্ষ্য। নিখুঁত কাজ প্রয়োজনীয়। কিন্তু জুকারবার্গ বলছেন- শতভাগ নিখুঁত কাজের চেয়ে কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুখ্য। ফেসবুক কোম্পানী তাদের অফিসের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে- **Done is better than perfect** এই বক্তব্যটি।

[<https://www.facebook.com/notes/eatlapps/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%8B/822965357851765/>]